বাজার করতে গিয়ে রোদের গরমে, দামের গরমে, ভিড়ের চাপাচাপিতে ঘেমে নেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন সুধাকর দত্ত। ছোটখাট চেহারার মানুষ, বেশ একটু গোলগাল সুখী সুখী চেহারা। লম্বায় চওড়ায় প্রায় সমান মুখটা এমনিতেই। একটু হাসি হাসি। মাথার একদম পেছনের একটুখানি অঞ্চল বাদ দিলে বাকিটা একটা সুন্দর উত্তল প্রতিফলক। পরিধানে সাধারণতঃ ধুতি পাঞ্জাবি বা পাজামা পাঞ্জাবী, এবং সব মিলিয়ে একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়। আজ পূজোর দিনে বাজার করতে এসে সেই ভদ্রলোককে অত্যন্ত নাকাল হতে হল। আজ আবার বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আসার একটা ব্যাপার আছে। তাই বাজারের ফর্দ বেশ বড়। দুটো ব্যাগের একটায় অনাজ, সদ্য ওঠা পালং শাকের বেশ খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে, কমলা রঙের একটা কুমড়োর ফালিও যেন উঁকি দিচ্ছে। আর একটা ছোট ব্যাগে মাছ নিয়েছেন বেশ খানিকটা। সেটা ব্যাগের আয়তনের পক্ষে একটু বেশীই হয়ে গেছে, ফুলে গোল হয়ে রয়েছে ব্যাগটা। মাছের বদলে মাংসই হয়ত নিতেন; কিন্তু কালিপদর মাংসের দোকানের সামনে আজ যেরকম ভিড় তাতে.....। সুধাকর বাবু বেঁটেখাটো মানুষ। দু-চারবার একটু ঠেলা দিলেন, কিছুই লাভ হল না তখন বাধ্য হয়েই ফিরতে হল।

" .....বাজারে ভিড় দেখেছেন আজ?"

"আর বলবেন না যেভাবে এরা দাম বাড়াচ্ছে!"

"তবু তো কেনবার লোকের অভাব হয় না। দেশের লোকের হাতে পয়সা নাই কে বলবে মশাই!"

সাধন ঝিাসকে পেয়ে তবু দুটো মনের কথা বলবার লোক পেলেন সুধাকর বাবু। মাছের বাজারে যখন হরির কাটাপোনা কিনছিলেন তখনই দেখলেন পাশের লোকটা কোথা থেকে একঢালা গলদা চিংড়ি নিয়ে এসে ফেলল। দেখে লোভ হল খুব। কিনেই ফেলবেন কিনা ভাবছিলেন এমন সময় কানে এল 'কুড়ি, কুড়ি, একদম ফ্রেশ মাল।' কুড়ি মানে একশ কুড়ি টাকা কেজি। সুধাকর বাবুর ইচ্ছার প্রদীপটা দপ করে নিভে গেল। তবু কি আশ্চর্য, মুহূর্তের মধ্যে ঠিক মাছির মত একদল লোক জুটে গেল। সেই মুশকো লোকটা, মাংসের দোকানে পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, এখানেও এসে জুটেছে। দেখেই চিনলেন সুধাকর বাবু। মনে মনে ভাবলেন--রাক্ষস নাকি লোকটা। মাংসও খাবে আবার চিংড়ি মাছও খাবে একই দিনে! খাক্, খেয়েই মরবে এরা.....! সুধাকর বাবুর পরিষ্কার মনে আছে ছোটবেলায় পূজোর চারদিনের একদিন বাড়ীতে চিংড়ি মাছ হতই। আর শুধু পূজো কেন, অন্য সময়েও যখনই চিংড়ি মাছ রান্না হত তখনই এই কুচোচিংড়ি কেউ খেত না। সেই চিংড়ির মালাইকারি নারকেলকোরা দিয়ে.....আহা। সুধাকর বাবুর জিভে জল এসে গেল। তাঁর চোখের সামনে প্রাগৈতিহাসিক চিংড়িরা শুঁড়ে নেড়ে খেলা করে বেড়াতে লাগল। চিংড়ির স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাজার ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় খেয়াল হল যদি ওরা আসে। বড়বৌদি তো আমিষ খাবে না, এক ঝামেলা। শেষ পর্যন্ত বিকাশের দোকান থেকে খানিকটা পনীর কিনতে হল! একশ টাকা নিয়ে বাজার এসেছিলেন, এখন একটাকা খুচরো টাকা পড়ে আছে। আর এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত, শুভ বড় হওয়ার পরেও, বিশ টাকা নিয়ে বাজারে এলে এক বস্তা বাজার হত। পনীরের দাম মেটাতে গিয়ে সেইসব সুখের দিনের স্মৃতিচারণ করছিলেন সুধাকর বাবু।

আজ যে পূজোর দিন সেটা সকালে বারোয়ারী তলার মাইকের বিকট চিৎকারে মনে পড়েছিল। কিন্তু বাজার করতে এসে লোকের ভিড়ে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। আবার মনে পড়ল বাজার থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য রিক্সায় বসে। ততক্ষণে গরমে ভিড়ে দুটো ভারী ভারী ব্যাগ বয়ে বেড়ানোর কষ্টে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। বয়স তো হয়েছে। এবার থেকে ছেলেকেই বাজারে পাঠাবেন--- মনে মনে ভাবলেন সুধাকর বাবু। অবশ্য ছেলেকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে তবে তো। রিক্সায় বসে বাইরের হাওয়ায় অনেকটা ভালো লাগল। সামনে লিচুতলা দুর্গোৎসব সমিতির প্যাণ্ডেল! অনেক প্রাচীন পূজো, একচালচিত্রের সনাতন প্রতিমা। ঢাকের বাদ্যি শু হয়েছে। কতদিন হয়ে গেল, উনষাটটা দুর্গাপূজো পেছনে ফেলে এসেছেন সুধাকর দত্ত। আর লিচুতলার এই পূজো ফেলে এসেছে একশ বত্রিশ বছরের ভাঙা ইতিহাস। দুজনেই আজ কালের কিনারায়।

সুধাকর বাবুকে নিয়ে রিক্সাটা যখন লিচুতলা মোড় ঘুরছিল তখন একটা সাইকেল খুব জোরে এসে সাঁ করে মোড় ঘুরে খুব তাড়াতাড়ি চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিল। সুধাকর বাবু খেয়াল করেননি, কিন্তু সাইকেল আরোহী খেয়াল করেছিল, আর অত্যন্ত সতর্কত

ার সঙ্গে নিজেকে আড়াল রেখেছিল। এর পিছনে দুটো কারণ ছিল। প্রথমতঃ রিক্সা আরোহীর সাথে সাইকেল আরোহীর একটা স
ামাজিক সম্পর্ক আছে এবং সেটা পিতা-পুত্রের। আর দ্বিতীয় কারণ যেটা আরও গুতর তা হল সাইকেল আরোহীর হাতে একটি
জ্বলন্ত বস্তু ছিল। ছেলে যে সিগারেট খায় তা যে বাবা জানে না এমন নয়, তবু বাবার সামনে দিয়ে ছেলে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে য
াবে এই ব্যাপারটাই বাড়াবাড়ি। তাই বলে সদ্য ধরানো ফিলটার উইলস্ একেবারে ফেলে দেওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। অন্য সময় শুভর
দৌড় বিড়ি কি বড় জোর প্লেন চারমিনার। তবে এখন পূজো, এই সময়ও যদি এরকম একটু বিলাসিতা না করতে পারে তবে আর
কবে হবে। .....তাই বাধ্য হয়ে সিগারেটের আগুন অভ্যস্ত হাতের আড়ালে নিয়ে, মুখটা আড়াআড়ি একটু নামিয়ে সাইকেলে স্পিড
তুলতেই হল। শুভ এখন যাবে অনুপমদের বাড়ীতে। দেবব্রত আসবে, সুশান্ত, প্রণবও হয়ত আসবে। এমনিতে কাজ তো কিছু নেই ক
ারই, তবু পূজোর সময় আড্ডা দেওয়াটাই একটা কাজ। আর এইরকম আড্ডা দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত যায়গা বোধহয়
অনুপমদের দোতলার ওই ঘর। আসলে ঘরটা ঠিক দোতলা নয়, দেড় তলার সিঁড়ির মাঝের ধাপে। ফলে বাড়ির মূল স্রোত থেকে
কিছুটা বিচ্ছিন্ন। এখানে বসে নিশ্চিন্তে আড্ডা মারা যায়, ধোঁয়া ছাড়া যায়, তাস পেটানো যায়, লাল দোপাট্টেওয়ালি বা চোলি কা
পিছে শোনা যায়। মাধুরী আর স্বর্গীয় দিব্যা ভারতীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। সেই ঘরের আরো একটি জিনিসের
প্রতি শুভদের একটা অমোঘ আকর্ষণ আছে। সেটা হল পূর্ব দিকের রাস্তার ওপর একটা বারান্দা। ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে যদিও
সূর্যোদয় দেখা যায় না, কারণ সামনে লাহাদের বিশাল তিনতলা বাড়ি আকাশের আধখানা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে, তবু এককালে
এই বারান্দা থেকেই অনেক নবীন আশার অণোদয় হয়েছিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই বারান্দায় একটা ঐতিহাসিক গুত্ব
রয়েছে। তবে সেই ইতিহাস কখনোই অবিমিশ্র সুখের নয়। আর এই পূজোর সময় সেই বিষন্ন ইতিহাসকে দূরে সরিয়ে রেখে এই ব
ারান্দায় একটা বিশেষ গুত্ব পায়, কারণ জাগৃতি সংঘের বারোয়ারীতলার যাবার এটাই একমাত্র রাস্তা।

এক ঝাঁক লাল হলুদ বেগুনী প্রজাপতিকে আড় চোখে পাশ কাটিয়ে শুভ যখন অনুপমদের বাড়িতে ঢুকল তখন দশটা বেজে গেছে।
ঘরে ঢুকে একজনকে দেখে বেশ একটু অবাক হতে হল। যাকে দেখে অবাক হল মাস দুয়েক আগেও তাকে দেখতে না পেলেই বেশী
অবাক হত ওরা। ওদের এই গ্রুপটার মধ্যে অরিজিৎ শুধু একজন ছিল বললে খুব কম বলা হয়। সুখে দুঃখে বিরহ মিলনে আড্ডায়
সিনেমা হলে সব-সময়েই অরিজিৎ ওদের সঙ্গে ছিল। দাণ জমাতে পারত। কিন্তু মাস দুয়েক আগে একটা খুবই অভিপ্রেত ঘটনা
অনভিপ্রেত ভাবে ঘটে যাওয়ার পর থেকে ওদের মধ্যে সম্পর্কের সুতোটা পচে যেতে যেতে এখন প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থায় এসে
পৌঁছেছে। এখন তো আর প্রায় দেখাই নেই। .....ঘটনাটা আর কিছুই নয়, একটা চাকরি। মোটামুটি নাম করা একটা কোম্পানীর
মাঝারী মাপের একটা চাকরি। কিন্তু কি করে? অনুপম পেল না, বিকাশ পেল না, শুভ পেল না, হঠাৎ অরিজিৎ পেল কি করে? ও দ
াবী করে ইন্টারভিউ ভালো দিয়েছিল, কিন্তু শুভরা কেউই সে কথা খুব একটা বিশ্বাস করে না। কেউ বলে ওর জ্যাঠার লাইন ছিল,
কেউ বলে লাইনটা ওর পিসতুতো দাদাদের। আবার অনেকের মতে ব্যাপারটায় ওর মেসোমশাইয়ের হাত ছিল। তবে হাত যারই
হোক কোন না কোন অদৃশ্য হাত যে পেছনে ছিল সে ব্যাপারে ওরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর। অদৃশ্য হাত তো থাকতেই পারে,
ওদের আপত্তিটা সেইজন্য নয়; আপত্তি অন্য জায়গায়। বন্ধুদের জন্য অন্য কিছু না কর অন্ততঃ সত্যি কথাটা তো বলা উচিত ছিল।
তা না, অনেক খেটেছি, ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছি এসব ভ্যানতাড়া মারার কি আছে? শুভরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে, কিছুই বে
ঝেনা! আর কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবার পর থেকে ওদের মধ্যে যোগাযোগ আরও কমে গেছে, বন্ধুত্বের যেটা একটা প্রাথমিক শর্ত। তাই
শিক্ষিত বেকারদের সঙ্গে চাকুরের বন্ধুত্ব আর তেমন দানা বাঁধেনি। তবু আজ পূজোর দিনে অরিজিৎ এখানে কেন? কি মনে করে?
.....ওদের অফিসের গল্প, লেডি স্টেনোর দুঃসাহসিক পোষাক পরিচ্ছদ আর বসের পিও র গল্প শুনেও শুভ ততটা উৎসাহ পেল
না। কোথায় একটা তার যেন ঢিলে হয়ে গেছে, কিছুতেই আর আগের সুর বাজে না, কোথায় যেন বাধে, সেটা কি ঈর্ষা?

সামনের পূজো, আর একবছর। তার মধ্যে একটা চাকরি হবে না? .....খাটতে হবে। প্রচণ্ড খাটবে শুভ। কিছু একটা করে দেখিয়ে
দেবে।..... কিন্তু কি করবে, কাকে কি দেখাবে সেটা পরিষ্কার জানা নেই শুভর। তাই আরও অস্থির লাগে। এক এক সময় মনে হয়
সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে দেয়।

বাজারের ব্যাগ রান্নাঘরে ব্যস্ত উত্তেজিত প্রবীণার জিম্মা করে সুধাকর বাবু ভাবলেন একবার বেরোবেন। গোবিন্দ, দ্বিজেন, ব্যান
র্জীবাবু সবাইকেই আসার সময় দেখে এসেছেন প্যাণ্ডেলের সামনে। পূজোর দিন অন্তঃত একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিৎ, নাহলে খ
ারাপ দেখায়। ওদের অবশ্য আলাদা ব্যাপার। পূজোয় ওদের ইন্ভল্ভ্মেন্ট অনেক বেশী। গোবিন্দ তো আবার প্রেসিডেন্ট না কি
যেন। একটা সময় এই পূজো নিয়ে কম মাতামাতি হয় নি। সে যুগে সুধাকর বাবুর উৎসাহ কিছু কম ছিল না। আর তখন এরকম রাস্ত
ায় ঘাটে ব্যাঙের ছাতার মত বারোয়ারী পূজো গজিয়ে উঠেনি।এই গোবিন্দ দ্বিজেন এদের তখন বয়স অল্প। বলতে গেলে এরাই প

াড়ার পূজোটা আরম্ভ করেছিল। সুধাকর বাবুও ছিলেন, তবে একটু দূরে দূরে। তখনকার আনন্দই আলাদা ছিল। পাড়ার সবাই থ াকত আনন্দ করত। বারোয়ারী হলেও অনেকটা ছিল বাড়ীর পূজোর মত। ওই গোবিন্দদের বাড়ী থেকেই পূজোর সবকিছু ভোগ জে াগাড় আসত। আর শেষপর্যন্ত হাতে কিছু বাঁচলে তাই দিয়ে একদিন বড় করে খাওয়া দাওয়া। আর একটা ব্যাপার হত ভাসানের পরদিন ---- বিজয়া সম্মিলনী। ওই প্যাণ্ডেলের মধ্যেই একটা তক্তাপোশ পেতে স্টেজ হত। খুবই ছোট ব্যাপার। তবু এই ব্যাপারটায় সুধাকরবাবুর খুবই উৎসাহ ছিল। তখন এরকম বাইরের লোক ধরে এনে গান গাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল না। যা কিছু হত সবই প াড়ার মধ্যে। দ্বিজেনের বোন শান্তি দাণ গান গাইত। সুলেখারা দুই বোনও ভালো গাইত। সুধাকর বাবু তখন একটু আধটু কবিতা বলতেন। একবার দেবতার গ্রাস পুরোটা আবৃত্তি করে বেশ খ্যাতি হয়েছিল। সে সব কবে চুকে গিয়েছে। এখন মাইক এসেছে। পাড় ার লোকের কানের মাথা খেয়ে দিনরাত গাঁক গাঁক করে বাজছে। এখনো বোধ হয় বিজয়া সম্মিলনীর নামে কিছু একটা হয়।ওই শিবেটা সেদিন বলছিল ফাংশন। সেটা আর যাই হোক সেদিনের বিজয়া সম্মিলনী নয়। বহুদিনের অভ্যাস, তাই সুধাকরবাবু এখন একবার গিয়ে বসেন, তারপর যখন 'আর্টিস' আসবার সময় হয় তখন বাড়ি ফিরে এসে বাইরের দিকের জানালাগুলো বন্ধ করে দেন। কালই তো বোধ হয়, বিকেলে মাইকে কিরকম একটা অসহ্য চিৎকার হচ্ছিল। সেটা না গান, না কবিতা, না নাটক, সুধাকর ব াবুর জানা কোন জিনিস নয়। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ছেলে বলেছিল ওটা নাকি র‍্যাপ সঙ, তাঁর বোঝার মত জিনিস নয়। অবশ্য সত্যিই পুরোটা বোঝেন নি সুধাকর বাবু। তবে এটুকু বুঝেছেন যে যুগ বদলে গেছে। মনে পড়ে গিয়েছিল গোবিন্দ একবার পূজো প্যাণ্ডেলের সামনে সিনেমার গান গেয়েছিল। নিত্যানন্দ বাবু, মানে গোবিন্দর বাবা সেটা শুনে ছেলের হাড় কখানা ভাঙতেই শুধু বাকি রেখেছিলেন। সেই গোবিন্দ সেদিন মেয়ের বিয়ে দিল। ভাবা যায়? সময়ের চাকা কেমন তাড়াতাড়ি গড়িয়ে চলে।

সুধাকর বাবু প্যাণ্ডেলের সামনে এসে দেখলেন বোস বাবু, মুখার্জী বাবু সবাই এসেছেন। বোস বাবুর চোখে কালো চশমা। সেই কবে ছানি অপারেশন করিয়েছেন। এখনো তার মানে ডাক্তার নতুন পাওয়ার দেয়নি। .....নিজের চোখটাও সমস্যা করছে। ছানি পড়ার বয়স তো হয়েছেই। একবার ডাক্তারকে দেখাতে পারলে ভালোই হোত। সুধাকর বাবু এগোলেন বোস বাবুর দিকে। ডাক্তার ত ালুকদারের চেম্বার, ভিজিট, রোগীর ভিড়, সবকিছু খুঁটিয়ে জানতে হবে।

অনেকদিন বাদে অনেকক্ষন আড্ডা হল। ডাক্তার তালুকদারকে নিয়ে শু হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে অন্য ডাক্তার, সরকারী হ াসপাতালের অব্যবস্থা, নার্সিং হোমের রমরমা। তারপর হঠাৎ করে বাজারের চড়া দাম, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মার্কিন আগ্রাসন, সরক ারের উদার নীতি। নীতি থেকে দূর্নীতি। শেষ পর্যন্ত কে বড় চোর নরসীমা রাও না জ্যোতি বসু সেই তর্ক অসমাপ্ত রেখে যখন সুধ াকর বাবু উঠলেন তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সমবেত চিৎকার ছোটকাকা, ছোটকা, দাদু.....দাদু। ভাইপো ভাইঝি জামাই নাতি নাতনীদের দুটো রিক্সা বাড়ীর সামনে থামল।

.....

দুটো ক্যাসেটকে কিছুতেই ঠিকমত সামলাতে পারছিল না শুভ। জামার বুক পকেট থাকলে সেটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা ছিল। কিন্তু এবারের পূজোয় যে রেডিমেড শার্ট গুলো কিনেছে সেগুলোর পকেট নেই। শুভর সখের মাকন জিন্স্ ----তাও যথেষ্ট টাইট ফিট। সেখানে ক্যাসেট ঢোকালে বিসদৃশ ভাবে ফুলে থাকে। তাতে অবশ্য কিছু যেত আসত না যদি না শুভর সেরকম একটা ইমেজ থাকত। আসলে ওকে দেখতে বেশ ভাল। ফর্সা লম্বা, চকচকে চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ সব মিলে স্মার্ট এবং হ্যাণ্ডসাম। তাই পূজোর দিনে নতুন জামাকাপড়ে পথ চলতি অনেকের কাছেই শুভ স্যুটেবল বয়। .....তাই বাধ্য হয়ে কিছুটা কষ্ট করেই এহাত ওহাত বদল করে ক্যাসেট দুটো বয়ে আনছিল শুভ। তবে গান শোনা বা নিজের ইমেজ রক্ষা করার জন্য এটুকু কষ্ট করা যেতেই পারে। বিশেষতঃ গান শুনতে যখন শুভ ভালোবাসে। গানের ব্যাপারে খুব একটা বাছবিচার নেই ওর, শুধু ক্লাসিক্যাল আর একান্ত ঘুমের সময় ছাড়া রবীন্দ্র সংগীত, এই দুটো বাদ। এর বাইরে সায়গল থেকে বাবা সায়গল, সন্ধ্যা, হেমন্ত, জ্যাকসান, ম্যাডোনা, জীবনমুখী বাংলা গান সব মিলিয়ে শতখানেকের বেশী ক্যাসেট শুভর ঘরের তাকে সাজান আছে। আর একদম তলার তাকে ধূলিধূসারিত খাপে ভরা কিছু পুরনো রেকর্ড পড়ে আছে। সেখানে বেশীর ভাগই শুভর অপছন্দর গান। আসলে সেগুলো বাবার এককালের সংগ্রহ, তাই ছেলে সে বিষয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে শুভর উপলব্ধি হল ক্যাসেট বয়ে আনার এই কষ্ট সবটাই বৃথা।। খেয়াল ছিল না আজ বাড়িতে অনেকের অ াসার কথা। ওর জাঠতুতো দাদা দিদিরা আসবে, সঙ্গে টুকাই, বুম্বা ওরাও নিশ্চয় আসবে, আর ওরা আসা মানেই .....ওফ্, সে

এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ওরা এলে যে শুভর খারাপ লাগে তা নয়, ভালই লাগে, হইচই করে সময় কেটে যায়। তবে সত্যিকথা বলতে কি এই পূজোর সময় শুভ পাড়ার পূজো, বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা, পাকখাওয়া, নানারকম 'ডিউটি' এই সব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে এর মধ্যে নতুন কোন কাজ বা অন্য কোন রকম ঝামেলা এসে পড়লে খুব বিব্রত লাগে।

এবার বয়েজ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী। ওদের প্যাণ্ডেলটা ফ্যান্টাসটিক হয়েছে। কোন একটা মন্দিরের ছাদে । তাছাড়া ভেতরে বাঁশের ক াজের যেসমস্ত 'ডেকোরেশন' রয়েছে সেগুলোও 'বিউটিফুল'। সামনের বার পাড়ায় শুভর সেক্রেটারি হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। সেরকম হলে একদম নতুন কিছু করতে হবে। শুভর মাথায় একদম নতুন কিছু করার নানারকম চিন্তা পাক খেতে লাগল। আকাশে একটু একটু মেঘ করেছে। জ্বালা করা রোদটাও আর নেই। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া হাওয়া আর পূজো প্যাণ্ডেলের মাইকে অনেক রকম গানের মিশ্র সুরের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে উদাস হয়ে গেল শুভ। সামনের পূজোয় যদি দাণ কিছু করে ফেলতে প ারে তখন সবাই কি বলবে? পাপিয়া পিয়ালীরা কি ভাববে.....? এরকম নানা অসম্ভব চিন্তার জাল ছিঁড়ে একসময় বাড়ির দরজ ায় এসে থামল শুভ। সামনে তখন প্যাণ্ডেলের এককোণে আড্ডা জমিয়েছে সেই পাপিয়া পিয়ালীরা আর কিছু রঙচঙে অচেনা মুখ। শুভ থামল, সবাই তাকাল; কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে, কেউ বা শুধু চোখ ঘুরিয়ে। কিছু বিস্ময়সূচক শব্দও কি সৃষ্টি হল না? সেদিকে একটা মোলায়েম হাসি উপহার দিয়ে শুভ যখন বাড়ি ঢুকল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

যদিও এটাই সুধাকর বাবুদের পৈতৃক বাড়ি তবু বর্তমানে এখানে সুধাকর বাবু ছাড়া দত্ত পরিবারের আর কেউই নেই। অবশ্য দত্ত পরিবার কোনো দিনই খুব বিরাট পরিবার ছিল না। সুধাকর বাবুরা ছিলেন দুই ভাই। ভাই সুধাকর আর দাদা দিবাকর। তাঁদের ব াবা ছিলেন জবরদস্ত লোক, ইংরেজ আমলের সরকারী কর্মচারী। তিনিই এইখানে জমি কিনে অনেক সখ করে এই বাড়ী বা নিয়েছিলেন। জবরদস্ত হয় নি। দাদা দিবাকর তবু কিছুটা, কিন্তু সুধাকর বাবু একেবারেই জবরদস্ত বাপের বিপরীত। আজীবন পোর্ট ট্রাস্টের কর্মী ছিলেন। সম্প্রতি, মানে মাস তিনেক হল রিটায়ার করেছেন। দাদাও মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। অবশ্য তার বহু অ াগে থেকেই, কর্মজীবনের শু থেকেই দিবাকর বাবু এই বাড়ী ছাড়া। তাঁর জীবনও বেশ বিচিত্র ধরনের, রোমাঞ্চকরও বলা যায়। সেসব কথা অবশ্য সবারই জানা। কিছুটা সত্যি, আর বেশ কিছুটা অতিরঞ্জন মিশিয়ে দিবাকর বাবুর গল্প এখনো এ পাড়ার বড়দের আড্ডার একটা প্রিয় বিষয়। তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবশ্য জন্মসূত্রে এবং কর্মসুত্রে এ পাড়ার যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। তাঁরা সবাই বর্তমানে কলকাতাবাসী। তবু পূজোর চারটে দিনের ভেতর অন্ততঃ একটা দিন এই মফস্বল শহরে দেশের বাড়ীতে আসাটা তাদের ক াছে এখন একটা প্রথা হয়ে গেছে। .....অনেক আগে, সুধাকর বাবুর ছোট বেলায়, তখন বাড়িতে আরও জমজমাট সমাবেশ হত। পিসিরা আসত। সুধাকর বাবুর মামার বাড়ীর দিকের বিশাল পরিবার তারাও আসত মাঝে মধ্যে। তখন দাণ মজা হত। সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে বিজয়াদশমীর কথা বাড়ীতে নাড়ু তৈরী , বিকেলে পাড়ার বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রণাম আর মিষ্টি খাওয়া। শুধু ওরাই নয়, বড়রাও প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী যেত। সে একটা অন্য রকম পরিবেশ ছিল। আজকের মানুষের মত সবাই তখন স্বার্থপর ছিল না। এখন মানুষ যেন কেমন হয়ে গেছে, প্রাণহীন, শুধু যে যার নিজেরটা বোঝে। হয়ত এটা অবশ্যম্ভাবী। দিন পালটাচ্ছে, সমাজ পাল্ট াচ্ছে। সুধাকর বাবুই বা এখন আর কজনের বাড়ী যান। গেলেও সেই প্রাণের স্পর্শ আর খুঁজে পান না। বাচচারাও এখন আর সারা সন্ধে এবাড়ি ওবাড়ি ছোটাছুটি করে বেড়ায় না। আসলে এটাই নিয়ম। সময়ের হাত ধরে সব পাল্টে যায়। যা পালটায় না তা ক্রমশঃ জীর্ণ হয়, শেষে একদিন ভেঙে পড়ে যায়। এই বাড়ীর পশ্চিম দিকে আগে একসার নারকেল গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলো এখন আর নেই। শেষ যে দুটো বুড়ো গাছ ছিল, যাতে আর ডাব ধরতো না, তার একটা এবারের ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। বাকি আছে একটা। সন্ধ্যায় যখন দিনের আলো নিভে আসে, ধূসর অন্ধকারের ভেতর ছাদে পায়চারি করতে করতে সুধাকর বাবু গ াছটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। শীর্ণ হেলে পড়া গাছটার মধ্যে হয়ত নিজেকে খুঁজে পান।

.....শুভ এখন যা যা করে তার বেশীর ভাগই অভ্যাসগত ভাবে করে। কোন কাজের জন্যই ভেতর থেকে আর তেমন চার অ াসে না, করতে হয় তাই করা। বি এসসি পাশ করে ফেলেছে শুভ। এম এসসিতে চান্স পাবে কিনা কে জানে। পেলেও আদৌ পড়বে কিনা তাও ঠিক করতে পারে না। ওর বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যে খুব খাটছে। মাঝে মাঝে সি এস আর এর প াতা উল্টোয়, অনেক কষ্ট করে দু-পাতা ইংরেজী পড়ে। তবু মন লাগে না, ভালো লাগে না। স্কুল জীবনে, ইলেভন্ টুয়েলভে বা তার পরেও বন্ধুত্বের যেমন গভীরতা ছিল সম্পর্কগুলো যত স্বাভাবিক-স্বচ্ছন্দ ছিল এখন আর তা নেই। এক কালের কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে এখন তো আর যোগাযোগই হয় না। আসলে এই জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই ভেঙে গড়ে; সম্পর্ক তাই ভেঙে যায় অ াবার গড়ে ওঠে। .....তবু রোজ বিকেল হলেই আড্ডা মারতে বেরোয়, না গিয়ে থাকতে পারে না। আসলে এটাও এখন একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে পূজোর দিনে আড্ডার তো একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকেই। জন্মের পর থেকে বরাবরই শুভ এই

শহরে। এখানকার সবকিছুর সঙ্গে ওর একটা নাড়ির যোগ তৈরী হয়ে গেছে। এখন তাই পূজোর কদিন নিজের জায়গা ছেড়ে এক পাও নড়তে চায় না। অনেক আগে শুভর মনে পড়ে পূজোর চারদিনের একদিন কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাওয়া হোত বাড়ীর সবাই মিলে। এখন অবশ্য আর হয় না। কেই বা যাবে ? পূজোয় এখন শুভর কত কাজ।

তবু এবারের পূজোয় শুভ একটু কম ব্যস্ত। এতদিন পূজোয় ওর যেগুলো অবশ্য কর্তব্য ছিল এবার তার মধ্যে বেশ কতকগুলো নেই। যেমন এবার পূজোর চারদিন চবিবশ ঘন্টা সময় পুরোটাই শুভর নিজের। সেটা ও একান্ত নিজের মত করে খরচ করতে পারে, সেখান থেকে কাউকে কিছুটা সময় ভাগ দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এবার কোন বন্ধন নেই শুভর। ঠাকুর দেখতে বেরোনো, রেষ্টুরেন্টে চাইনিজ খাওয়া, সিনেমায় যাওয়া কোন কিছুতেই এবার তেমন বিশেষ কোন ব্যাপার নেই। এত স্বাধীনতা কি ভাল? ভাবতে চেষ্টা করে যে আমি মুক্ত বিহঙ্গ। তবু মাঝে মাঝে কোথায় যেন গোলমাল হয়ে যায়। এক আকাশের থেকে অন্য আকাশের দিকে উড়ে বেড়াবার মত ডানার জোর এই বিহঙ্গের আর নেই।

শুভ সন্ধেবেলায় মাঠে এসে দেখল অনেকে এসেছে। যাদের সঙ্গে এমনিতে প্রায় দেখাই হয় না, পূজোর সময় সে রকম অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যেমন বাবলু। গত বছর ওদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোটেকশান ফোর্সের যে রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল তাতে বাবলু চান্স পেয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনরকমে একবছর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আসলে ওদের ট্রেনিং পিরিয়ডে নাকি কোন ছুটি নেই। তবু বাঙালী বলে এই পূজোর কদিন ওকে ছুটি দিয়েছে। ধাপিতে আজ বাবলুর ট্রেনিং পিরিয়ডের নানারকম রোমহর্ষক এবং অবশ্যই অতিরঞ্জিত গল্প শুনতে শুনতে অনেকটা সময় কেটে গেল। বাকি সময়ের খানিকটা কাটল পূজোর রঙিন পথ চেয়ে চেয়ে, আর দুই পূজো, অমিতাভ, স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনুষ্ঠান, সন্তান সংঘের প্যাণ্ডেল, রথতলায় দেবুর দিনরাত ঘুর ঘুর করা এই সব টুকরো কথার জোড়াতাড়ায়।

তবু সেইসব বন্ধন কাটিয়ে শুভ আজ তাড়াতাড়ি উঠল। পাড়ার পূজোতলাতেই বাকি সন্ধেটা কাটাতে পারলে ভাল হয়। পিয়ালীরাও হয়ত থাকবে আজ। ওদের পাড়ায় নতুন বাড়ী করে এসেছে এক ডাক্তার। তার মেয়ে সুদীপ্তা। অক্সিলিয়ামে ফার্স্ট গার্ল। 'বীভৎস' ভালো দেখতে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকার মত । পূজোর চাঁদা, তার বিল, পূজোর প্রসাদ এরকম এটা সেটা ছুতো করে বার পাঁচেক ঐ বাড়ীতে ঘুরে এসেছে শুভ, তবু এখনও ঠিকমত আলাপ হয়নি। আজ একবার চেষ্টা করতেই হবে। বাবার আদ্যিকালের ল্যামব্রেটা স্কুটারটায় লাথি কষাল শুভ।

ফেরার সময় কেন কে জানে বাড়ী যাওয়ার সোজা রাস্তায় গেল না শুভ। গেল একটু ঘুর পথে, যে পথে এককালে প্রতিদিন যাওয়া আসা ছিল ওর। সেই বাড়ীর কাছাকাছি এসে শুভর গাড়ীর গতি ধীর থেকে ধীরতর হল। গতবছরেও আজকের দিনে ওরা একসঙ্গে বেরিয়েছিল। গতবছরের কতকিছু বদলে গেল। কিম্বা হয়ত কিছুই বদলায় নি। আসলে নাটকটা একই আছে, শুধু তার চরিত্র গুলো পাল্টে গেছে। আগের দৃশ্যে শুভ ছিল, এই দৃশ্যে নেই। তার জায়গায় অন্য কেউ অভিনয় করছে এখন।.....ঘাড় উঁচু করে শুভ তাকে দেখতে পেল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে, ঘাড়ের কাছে খুব ঝকমকে লাল ওড়নার অংশ বিশেষ। বেরোবে নিশ্চয়। দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ীর সামনেটা পার হয়ে গেল শুভ। আর ঠিক তখনই পাশের গলির মোড় থেকে একটা গা জ্বালা করা স্বর--"এই যে শুভ, আজ এদিকে কি মনে করে?" শুভ তাকিয়ে দেখল পিন্টু, ওদের দলটা আড্ডা মারছে গলির মোড়ে। ওকে দেখলেই আজকাল গা জ্বলে যায়। শালা সব জানে, জেনেশুনে আওয়াজ দেয়। না হলে এমন অনাবশ্যক চিৎকার করে এই কথাগুলো শুভকে শোনানোর কোনো প্রয়োজন ছিল? সামনেই খোলা জানলা। এই আওয়াজটা নিশ্চয়ই ওর কানে যাবে। কি ভাববে? শুভ এখন ঘুর ঘুর করে। নিজের ওপর বিতৃষ্ণায় দু কান লাল হয়ে গেল ওর। একটা কথারও জবাব না দিয়ে দ্রুত গলিটা পার হয়ে গেল। বড় রাস্তায় পড়ে গাড়ীর গতি বাড়াল শুভ। ও সেই ছেলেটাকে চেনে। খেলার মাঠে অনেকবার দেখেছে। ভাল ক্রিকেট খেলে ছেলেটা। তবে খেলার জগতে শুভই বা কম যায় কিসে! মাঠে কোনদিন মুখোমুখি হলে দেখিয়ে দেবে।

গাড়ীর গিয়ার পাল্টাল শুভ। পূজোর দিন রাস্তায় যথেষ্ট ভীড়। এই অবস্থায় এত জোরে গাড়ী চালানো কখনই উচিত নয়। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু শুভর চোখের সামনে এখন সব ফাঁকা, শুধু একটা সবুজ মাঠ; তার মাঝে বাইশ গজ ফাঁক দিয়ে দু-সার উইকেট। তার ওই প্রান্তে প্রতিপক্ষ আর এই প্রান্তে শুভ। হাতে আলো পিছলে যাওয়া চকচকে লাল একখানা বল। দুখানা রিক্সার ফাঁক দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে বেরিয়ে গেল স্কুটারটা। ওভারের শেষ বল, শুভ দৌড় শু করল। পেছনে সমুদ্র গর্জনের মত দর্শকের চিৎকার। শুভর স্কুটার এখন এক্সিলেটারের কানমলা খেয়ে উর্ধ্বাসে ছুটছে। সামনেই লিচুতলা মোড়। শুভ দৌড়াচ্ছে।

স্টাম্পের পাশ দিয়ে পপিং ত্রিজে ডান পা পড়ল। বাঁ হাত ওপরে উঠাল। তারপর কাঁধের সমস্ত জোর দিয়ে লাল বলটাকে ছেড়ে দিল শুভ, দেখল গুডলেংথ নিশানার সামান্য আগে থেকে বিষাক্ত সাপের মত লাফিয়ে উঠছে বলটা। .....আর ঠিক তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা। লিচুতলার বাঁকে এসে হঠাৎই থেমে গেল সামনের রিক্সা দুটো। সে দুটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে ব্যালান্স হারালো শুভ। শেষ মুহূর্তে বাঁচাতে বাঁচাতেও পাশের সাইকেলটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল।

বেধড়ক মার খেতে পারত শুভ। বরাত খুব ভাল তাই সে রকম কিছু হল না। অবিশ্রান্ত অশ্রাব্য গালাগালির মধ্যে এবার খুব সাবধানে স্কুটারের স্টার্ট দিল। সবুজ মাঠটা চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে। ওভারের শেষ বলটায় কি হল তাও বোঝা গেল না। শুভ অনুভব করল ওর সমস্ত শরীরটা এখন একটা তেতো স্বাদে ভরে গেছে।

.....

সুধাকর বাবু মনে করেন বয়স হলে লোকে যেমন পাল্টে যায় উনি তেমন পাল্টান নি। এই ব্যাপারটা তিনি শুধু যে মনে করেন তাই নয়, রীতিমত বিশ্বাসও করেন। আর তাই সুযোগ পেলে বলেও ফেলেন। তবে কথাটা সত্যি। বয়স মানুষকে অনিবার্য ভাবে যেটুকু পাল্টে দেয় তার বাইরে সত্যিই খুব একটা পাল্টাননি সুধাকর বাবু। যৌবনের কিছু কিছু দুঃসাহসিক কাজ বাদ দিলেও এখনও তিনি আর পাঁচজন বৃদ্ধের থেকে কম বৃদ্ধ। রূপ, রস, গন্ধে ভরা এই পৃথিবী সমস্ত আবেদন নিয়ে এখনও ধরা দেয় তাঁর কাছে। এতদিনের পাওয়া না পাওয়া লাভ ক্ষতির হিসাব মাথায় নিয়ে তবু এখনও তিনি ওই জীবনের প্রবাহকে উপভোগ করেন। এই দুর্লভ ক্ষমতা এখনও সুধাকর বাবুর মধ্যে সমান ভাবে রয়েছে। এখনো এখানকার রবীন্দ্রমঞ্চে কোন ভাল থিয়েটার বা সিনেমা হলে ছেলেকে দিয়ে পরের দু-খানা টিকিট কাটিয়ে রাখেন। এই তো সেদিন তালতলার মাঠে ভীমসেন যোশী, দীপক চৌধুরী, আমজাদ আলীর অনুষ্ঠান শুনলেন সারা রাত ধরে; মন ভরে গিয়েছিল।

নির্বিবাদী সৎ ভালোমানুষ বলে খ্যাতি বা অখ্যাতি কর্মক্ষেত্রে সারাজীবন সুধাকর বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। পোর্টট্রাস্টের কর্মী ছিলেন আজীবন, খুব উঁচুতে নয়, আবার একেবারে নীচুতেও নয়। তবু উঁচু নীচু আর মাঝের তলার সকলের কাছেই দত্ত বাবু বা দত্ত দা ভালোমানুষ সহকর্মী ছিলেন। অজাতশত্রু হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে দু-একজনের খুব মৃদু একটু শত্রুতা ছিল। এছাড়া সত্যি তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। সারাজীবন কর্মক্ষেত্রে শুধু তাঁর দক্ষিণ হস্তকেই ব্যবহার করেছেন; আর একটা হাত ব্যবহার করার কথা কখনো মনে হয় নি। সুযোগ যে একেবারে ছিলনা তা নয়। আশেপাশে বহু সহকর্মীকে সারাজীবন ধরে দেখেছেন , তবুও হয়ত তাই কর্মজীবন শেষ করে আজও তাঁর একখানাই পৈতৃক বাড়ী, সেটার কোনও পরিবর্ধন বা সংস্কার হয়ে ওঠেনি। তেজী শেয়ার বাজারের নামী বা অখ্যাত কোন রকম কোম্পানীর একটাও শেয়ার তাঁর নেই। গোটা কয়েক ব্যাঙ্কে কয়েকটা ছোটখাট অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাস, আর কিছু নেই। বাড়ীতে ভি সি আর, ভি সি পি নেই। টি ভি একটা আছে বটে, তবে সেটা ছোট আর সাদা-কালো। এয়ার কণ্ডিশনার নেই, ওয়াশিং মেশিন নেই, জিভ বার করা অ্যালসেসিয়ান নেই, অনেক কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই। ছেলেটা বি এস সি পাশ করে বসে আছে, কি করবে ভগবান জানেন। এখনকার চাকরির বাজার ঠিক কিরকম সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকলেও সেটা যে আর আগের মত নেই সেটুকু জানেন সুধাকর বাবু। তাই চিন্তা আরও বেশী হয়। ছেলে যতই সাবালক হয়ে গেছে বলে মনে কক, 'আমার জন্য কিছু ভাবতে হবে না', 'আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব' জাতীয় কথাবার্তা যতই বলুক, সে সব যে অন্তঃসারশূন্য তা তিনি ভালই বোঝেন। আর পিতার কর্তব্য বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। সেটা ছেলের পক্ষে যতই অসহ্য হোক তবু কর্তব্য পালন তো করতেই হবে। ভাইপোরা বলছিল কলকাতায় কোনও একটা ম্যানেজমেন্ট বা কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য; তাতে নাকি চাকরি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সে তো অনেক টাকার ব্যাপার; অত টাকা কোথা থেকে আসবে।

সুধাকর বাবু তাঁর দোতলার ঘরে, রাস্তার দিকের জানলার ধারে, তাঁর বহু প্রাচীন মস্ত হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে চিন্তার এই সমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছিলেন। একটু আগে পূজোতলা থেকে ফিরেছেন, তারপর আর ঘরে আলোটাও জ্বালা হয়নি। আধো অন্ধকার এই ঘরে সুধাকর বাবু এখন সবার ভাবনা নিয়ে একেবারে একা। এরা সব ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে, গৃহকত্রী গৃহকর্মে ব্যস্ত, কাল বিজয়াদশমী। আর ছেলের তো পাত্তা নেই সেই বিকেল থেকে। খোলা জানালা দিয়ে নিচের রাস্তা আর ঠাকুরতলার বাঁদিকটা দেখা যাচ্ছে, ভিড়ে ভর্তি! পূজো শুরু হয়েছে। ঢাকের বাদ্যি আর সঙ্গে ধুনুচি নাচ। ওই ভিড়ের মধ্যে শুভ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আজকাল ছেলে কখন কোথায় থাকে সে খবর সুধাকর বাবুর কাছে থাকে না। ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে, তারও পর যুগ

পাল্টে গেছে। নিজের ছেলেকেও তাই এখন সবসময় চিনতে পারেন না।

এরকম ভাবে সুধাকর বাবুর চিন্তার সূত্রটা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে শুধুই ঘোরাফেরা করে বেড়াতে লাগল। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন ভাবনাগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে নিতে। একটা একটা করে সেই ভাবনাগুলোর সমাধান করতে। কিন্তু কিছুতেই সেই অস্থির সূত্রটাকে স্থির করতে পারলেন না। একবার মনে হল এমারজেন্সি লাইটের ব্যাটারীটা ফেটে গেছে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা সারাতে হবে। তার পরক্ষণেই মনে পড়ল সামনের বছর তাঁর একটা পলিসি ম্যাচিওর করবে; সেটা দিয়ে ছেলেকে কোন একটা কোর্সে ভর্তি করে দেওয়া যেতে পারে। এক সময় ভাবলেন এই রবিবারেই চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন। তারপরেই মনে হল কাল দশমী, কিছু মিষ্টি কিনে রাখতে হবে, আজই কেনা উচিত ছিল, কাল আবার দাম বেড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সমাধানহীন ভাবনার স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সুধাকর বাবু। প্রাচীন চেয়ারে একটা বৃদ্ধ শরীর অসহায় ভাবে পড়ে রইল। একসময় ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল আর একটি ছায়া। "কি হল, অন্ধকারে ভূতের মত বসে আছ কেন?" শুনতে পেলেন না সুধাকর বাবু। "কি গো কি হল তোমার, শরীর খারাপ লাগছে?" একটা অত্যন্ত ব্যাকুল স্বর তাঁকে প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল। গভীর ঘুমের ভেতর থেকে যেন জেগে উঠলেন সুধাকর বাবু। চোখ মেলে দেখলেন সামনে স্ত্রীর উদ্বিগ্ন মুখ। চারিদিকে আলো, ঘরে আলো জ্বলছে, মাথার ভেতরটাও অনেক হালকা হয়ে গেছে। সুধাকর বাবু বুঝলেন এবার আস্তে আস্তে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

নীচে পূজোতলায় তখন. ঢাক বাজছে, কাঁসর বাজছে, ধুনোর গন্ধে আর ধোঁয়ায় ভারী হয়ে আছে বাতাস। মণ্ডপের ডানদিকে ক্লাবঘরের রকে তখন গোল হয়ে বসে আড্ডা জমিয়েছে শুভ, পিয়ালী, সুদীপ্তারা।